অনুবাদক (বাঙলা)

এ.কে.এম.আমিনুল হক

মূল (হিন্দী) ঃ

কাজী আশ্‌রাফ মাহমূদ

কটজ

অনুবাদ (বাংলা) ঃ

এ. কে. এম. আমিনুল হক

প্রকাশক ঃ

কাজী আশ্‌রাফ মাহ্‌মুদ

১৪৩ সেগুন বাগীচা

ঢাকা—২

জানুযারী, ১৯৫৬

মুদ্রাকর ঃ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

১১৩, সেগুনবাগান

ঢাকা—২

কাজী আশরাফ মাহমুদ

ভূমিকা

"কুটজ" পাহাড়ী ফুল, রামগিরি হতে নির্ব্বাসিত যক্ষ প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মেঘকে দূতরূপে অলকায় পাঠাতে চেয়ে "কুটজ" এর অর্ঘ্যদানে তাকে সন্তুষ্ট করেছিল। আমাদের দেশে এই ফুল বিরল।

তেম্‌নি বিরল আমাদের দেশে হিন্দী ভাষার চর্চ্চা, কিন্তু কাজী আশরাফ মাহমুদের লিখিত হিন্দী কবিতাগ্রন্থ "কুটজ" পড়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলাম, এখন তার বাংলা অনুবাদ ক'রে আমাদের কাছে ধরে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ, কে, এম, আমিনুল হক সাহেব।

কবিতা সাধারণতঃ অবগুণ্ঠিতা নবোঢ়ার মত, তাকে প্রথম দর্শনেই কিছু বোঝা যায় না, তার উপর এক ভাষা থেকে ভাষান্তরে আনতে হলে ছন্দ ভাব ও ভাষার সমতা রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার। তবুও আমাদের বাংলা দেশের সন্তান হিন্দী ভাষায় কাব্যচর্চ্চা করেছেন, এ আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। আরও আনন্দের কথা—যদি এঁর অনুবাদ কাব্য রসিক মহলে সুপরিচিত হয়ে রসঘন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

অনুবাদটি সার্থক হয়েছে কিনা সে বিচারের ভার আমার উপর নয়। কিন্তু অনুবাদকের আগ্রহ ও আন্তরিকতাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মূল লেখকের কাছে আমরা আশা করব যাতে তিনি হিন্দী ভাষার চর্চ্চা বজায় রেখে অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করতে সাহায্য করেন।

কয়েকটি ছোট কবিতা সত্যিই আন্তরিকতায় বেদনা মাধুর্য্যে অনবদ্য।

ধানমণ্ডি, ঢাকা। — সুফিয়া কামাল

**"Camerado, this is no book,
Who touches this touches a man."**

কৈফিয়ত

জনাব কে. এ. মাহমুদ সাহেবের "কুটজ" পড়ে দেখবার সুযোগ ঘটে মাত্র সেদিন। কুটজের কবিতাগুলো সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব যা বলেছেন তার পরেও আবার কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কবিতাগুলো আমার কাছে কত বেশী ভাল লেগেছে তা শুধু মুখে না বলে অনুবাদের প্রয়াসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।

অনুবাদ-সাহিত্য কখনো মূল সাহিত্যের মত সাবলীল বা মর্মস্পর্শী হতে পারে না, আর এ সত্য বোধ হয় কবিতার ভাষা সম্বন্ধে আরো বেশী প্রযোজ্য।

কুটজের কবিতাগুলো কবির অন্তরের অভিব্যক্তি। নিতান্ত অনভিজ্ঞের হাতে অনূদিত হয়ে তাদের অঙ্গহানি হয়েছে সেজন্য কবির কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কাব্যানুবাদ করতে গিয়ে মূলভাষা ও বক্তব্যের যতটুকু কাছে থাকা যায়, সে চেষ্টা করেছি বলে অনুবাদের কোন কোন স্থানের ভাষা বাঙলা বাগ্‌ধারানুযায়ী আমার নিজের কাছেই শ্রুতিকটু মনে হচ্ছে। কবির অনুমতি ছাড়া কবিতার ভাবের বা মূল বক্তব্যের কোনও প্রকার পরিবর্তন অসম্ভব। তাঁর অনুমতি পেলে ভবিষ্যতে স্বচ্ছন্দ অনুবাদের ইচ্ছে রইলো।

এই বঙ্গানুদিত কাব্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি কষ্ট করে দেখে দেওয়ার জন্য আমি বিশেষ করে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকে আমার সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভূমিকা লিখে দিয়ে বেগম সুফিয়া কামাল সাহেবা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় —অনুবাদক

মে ১৫, ১৯৬৬

"Love made me poet,
And this I writt,
My harte did doe yt,
And not my witt."

অনুরোধ

জিজ্ঞাসো না মোরে, বন্ধু,
এই গীতির কী জনম-বিকাশ
প্রেমই হয়তো লিখবে কভু
যা কিছু তার ইতিহাস।

—মাহ্‌মূদ

রামটেক
১ জুলাই, ১৯৪৬

অনুসরণী

কবিতারাণী

কবি, কার বা প্রেমের মহিমাতে
মুখরিত তব বাণী হে
কোন্ সে পুরে থাকে তোমার
প্রেমের কবিতা-রাণী হে ?

বন্ধু, মানসরাণীর মধুর নাম
—কী বলিবো ?—ও যে "কানী",
যে পুরেতে বিরাজে সে
সেই পুরের নাম পিলানী (১)।

ওরি মঞ্জুল মুখছবিতে
মন হলো মোর ধ্যানী,
ওরি মুখের মাধুরীতে
মুখরিত মোর বাণী।

নাগপুর
বসন্ত-পঞ্চমী, ১৯৪৬

---

(১) পিলানী রাজপুতানায় অবস্থিত।

কী গান গাবো ?

বন্ধু, গান গেয়ে যেতে চাই
কী সুরে গান গাবো গো,
কোন্ কথাতে প্রেম প্রকাশি
পরাণ খুলে দেখাবো গো ?

অবুঝ পরাণ, হায়, বুঝে না
সব কিছু আজ গাহিতে চায়
হুর্বিষহ বেদন-গীতি
তাই সবারে শুনাতে চায়।

নাগপুর
১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

গেয়ে যারে আপন-ভোলা

গেয়ে যারে আপন-ভোলা
কান্না-হাসির গানগুলি,
যা হয় হবে, গারে তবু
গেয়ে যা আজ প্রাণ খুলি

সুখ-দুঃখের ভুবনে এসে
কভু কেঁদে, কভু হেসে
কান্না-হাসির করুণ রসে
গেয়ে যারে প্রাণ খুলি,

গেয়ে যারে অভিমানী
কান্না-হাসির গানগুলি।

গেয়ে যারে তুই আজিকে
কান্না-হাসির সুরগুলি,
যা হয় হবে, আজকে দেরে
মনের যতো দোর খুলি

যা কিছু তোর মনে আসে,
যা কিছু মন ভালবাসে
যাতে হৃদয় কাঁদে, হাসে
গেয়ে যা আজ সব ভুলি,

গেয়ে যারে মন আজিকে
কান্না-হাসির সুরগুলি।

গোঁদিয়া
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

অনন্য অভিলাষ

চাইনা আমি এই জগতে
রাজ-ভবনের শোভা-শান,
চাইনা আমি মুক্তা-মাণিক
চাইনা আমি রাজ্য মহান।—

চাই যে আমি এই জগতে
শুধু শুভদ্রার ভালোবাসা,
ওর সুষমা-সম্পদ আর
ওরি প্রাণে একটি বাসা।

নাগপুর
১২ আগষ্ট, ১৯৪৫

প্রেমের মূল্য

প্রেমদেবেরে জিজ্ঞাসিনু :
"পূরবে কবে বাসনাগুলি ?"
মৃদু হেসে কয় প্রেমদেব :
"যখন দেবে নিজকে বলি !"

প্রেম-রতন সে এতই সুলভ
এতই সহজ প্রেমের পথ,—
মনটা আমার উঠ্‌লো নেচে—
পূরবে এবার মনোরথ !!

নাগপুর
৯ অক্টোবর, ১৯৪৪

বড়ই কঠিন

পরকে আপন করে পাওয়া
এতো কভু সহজ নয়,
বড়ই কঠিন এই বসুধায়
প্রেম-রতন যে পেতে হয়।

চঞ্চল ধরায় অচঞ্চল প্রেম
পাওয়া কঠিন অতিশয়,
বড়ই কঠিন ধরায় পাওয়া
প্রেমিক নামে পরিচয়।

নাগপুর
১৭ নভেম্বর, ১৯৪৪

প্রেম-স্বরূপা

দেখিনু ওরে এই আঁখিতে
দেখি কুরূপা কানী,—
প্রেম-নয়নে দেখিনু যবে
সে যে রূপসী রাণী !

বাহু-ডোরে বাঁধতে গেলাম
চঞ্চলা সে দেয় না ধরা,—
প্রেম-বাঁধনে বাঁধতে গেলাম
বঁধু আমার এলো ত্বরা !

নাগপুর
১৬ আগষ্ট, ১৯৪৫

বরণ-মালা

একদিন এসে বল্‌লো হেসে
আমার মনের মধুবালা ঃ
"এসো, প্রিয়, তোমার গলে
পরাবো আজ বরণমালা।"

আনন্দেতে অধীর হয়ে
পরে নিলাম সেই যে মালা,
তখন কি আর জানি আমি
সইতে হবে বিষের জ্বালা !!

নাগপুর
২৪ নভেম্বর, ১৯৪৪

বিচ্ছেদ

ওয়ার্ধার (১) রেল ষ্টেশনে এসে
ছলছল চোখে হেসে
জিজ্ঞাসিল সখী আমার
"আবার কবে আসবে ফিরে ?"

শুনে তার সে করুণ স্বর
ব্যথায় ভরে মোর অন্তর,
জবাব খুঁজে পাই নি, শুধু
চোখ ভেসে যায় বাষ্পনীরে।

নাগপুর
২৮ নভেম্বর, ১৯৪৪

(১) ওয়ার্ধা মহারাষ্ট্র ষ্টেটে অবস্থিত।

রামটেকের ঐ প্রাণ-ফলকে

রামটেকের (১) ঐ প্রাণ-ফলকে লিখা যে প্রেম-কাহিনী
দরদর ঝরে বলে সে কাহিনী আমার আঁখির পানি।

জনহীন ঐ শৈলশিখরে
বাঁধা যে প্রণয়-ডোর
দেখিয়াই তারে কেঁদে কেঁদে উঠে
বিরহী যৌবন মোর।

সেই শৈলশিরে মিলেছিনু দোঁহে—কোথা সে নয়ন-প্রিয়া
বিরহে যাহার ফিরিছে কাঁদিয়া আমার বিরহী হিয়া।

হায় কোথা আজি প্রিয়তমা মোর
কোথা তুমি আজ লুকায়ে রলে ?—
উগ্র নিঠুর নীরবতা কয়—
"সে তো পিলানী গেছে চলে !"

রামটেক
৩০ নভেম্বর, ১৯৪৪

(১) মহারাষ্ট্র ষ্টেটে অবস্থিত রামগিরি পর্বত।

কেমনে ভুলি

হায় কভু কি ভুলতে পারি
—আমি যে তার প্রেম-পাগল,-
মিনতি তার কেমনে ভুলি,
কেমনে ভুলি নয়ন-জল,
কেমনে ভুলি : "প্রেম ভুলো না"!

বল্‌তো আমার রূপ-কুমারী
"থাকবো আমি হয়ে তোমারি
ভুলোনা মোর নয়ন-বারি
আমি অসহায় ললনা,
প্রিয়তম, মোর প্রেম ভুলো না !"

হায় কভু কি ভুলতে পারি
—আমি যে গো প্রেম-পাগল-
কেমনে ভুল্‌বো মিনতি তার
কেমনে ভুল্‌বো আঁখি সজল ;
ভুল্‌তে পারি ঃ "ভুলে যেয়ো না" !

বল্‌তো কেঁদে আকুল হয়ে
"স্মৃতি আমার বুকে লয়ে
থেকো, প্রিয়, আমার হয়ে
—কভু ফেলে যেয়ো না,
প্রভু, আমায় ভুলে যেয়ো না !"

নাগপুর
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫

দুদিন

বলিতে হায় ফাটে ছাতি—
কেঁদে কেঁদে দিন কাটে মোর,
কেঁদে কেঁদেই কাটে রাতি !

একলাটিতেই এই জগতে
চলতে হয় যে কণ্টক-পথে
পদে পদে হয় সহিতে
জীবনের সংঘাত ;—
হায় কভু কি জানতাম আমি
কেঁদে কেঁদেই কাটবে রাত !

বলিতে যায় বুক ফাটি—
নির্জনে মোর দিন কাটে যে
নির্জনেতেই কাটে রাতি !

জীবন-পথে, হায়, প্রতিপল
গর্জিবে যে শুধুই বাদল,
চল্‌তে পথে পথই কেবল
হবে আমার সাথের সাথী ;—
কে জানিত কাট্‌বে এমন
নির্জনেতেই দিবস-রাতি !

হায় কভু কি জান্‌তাম আমি—
পথে পথেই কাট্‌বে দিবা
পথে পথেই কাট্‌বে যামী !

পথে পথে ফিরে যখন
থেমে যাবে শ্রান্ত চরণ,
পথই যে মোর হবে শরণ,
কাট্‌বে পথেই নিঝুম রাতি
কে জানিত পথই কেবল
হবে আমার শয়ন-সাথী !

রায়পুর
শরৎ-পূর্ণিমা, ১৯৪৬

হা মোর বেদন

হা মোর বেদন,

যদি তোমায় একটিবার-ও

পারতাম দিতে বাণী

পাষাণ-পরাণ জল্লাদের-ও

ঝরতো চোখে পানি !

বৈতুল

২০ নভেম্বর, ১৯৪৬

সেরা বন্ধু

বন্ধু, ঘাতক, তোমায় আমি
সেরা বন্ধু মানি,—
এই বেদনে বাঁচাও আমায়
শিরে অস্ত্র হানি।

নাগপুর
২৩ নভেম্বর, ১৯৪৬

মিনতি

পরের দুখে না মানে দুখ
পরের ব্যথায় হয় না সদয়,
সব কিছু দাও তারে, প্রভু,
দিয়ো না কেবল এমন হৃদয় !

নাগপুর
১৯৫৭

কামনা

যত চাও তুমি দুঃখ দিতে
　　　　　ততই মোরে দুঃখ দিয়ো,
সুভদ্রার জীবনে, প্রভু,
　　　　　সদাই কেবল সুখ দিয়ো !

যদি চাও প্রভু, সংকট দিতে
　　　　　পদে পদে মোরে সংকট দিয়ো,
কিন্তু সুভদ্রার জীবন-পথে
　　　　　কভু না যেন কণ্টক দিয়ো !

সপ্ত নরকের দহন দেবে—
　　　　　প্রভুবর, মোরে তা দিয়ো,
সুভদ্রারে স্বপ্নেও তবু
　　　　　বিরহ-বেদন না দিয়ো !

যদি চাও, প্রভু, দিতে কিছু
মোরে তবে এ বর দিয়ো,
যে ঘরে সদা প্রেম বিরাজে
সুভদ্রারে সে ঘর দিয়ো।

রামটেক
১৯৪৪

প্রণয়-মন্ত্র

প্রিয়ার পথে যতই, প্রভু,
আস্‌বে বিষম শূল
আমার প্রণয়-মন্ত্রে যেন
হয়ে যায় সব ফুল !

শেষ ইচ্ছা

মোর জীবনের প্রেয়সী গো,
আমার কবর-শিলা 'পর
কোনো একদিন লিখে যেয়ো
"ধরায় শুধু প্রেম অমর !!"

বিভ্রাট

প্রভু গো, কেমন করে সে রইবে বেঁচে
সুভদ্রায় যে পেলো না ?
জগত ছেড়ে সে কেমনে যাবে
সুভদ্রা যে এলো না ?

মিলন-সংবাদ

আজকে বুঝি প্রিয়ার মনে
জাগ্‌লো মধুর স্মৃতি হে !—
পোস্টম্যান্‌ যে এলো নিয়ে
মিলন-বার্তা চিঠি হে !!

শুধুই একটা চিঠি কর্‌লো
মন কত উন্মাদ হে !—
আস্‌বে আজি প্রাণের প্রিয়া,
মিটবে প্রাণের সাধ হে !!

তার দুটো আঁখি

প্ল্যাট্‌ফর্মে যে আঁখিরে
দেখতেছিলো সব নয়ন,
না জানি, হায়, খুঁজতেছিলো
কোন্ আঁখিরে ঐ নয়ন !—

হায়, কী বল্‌বো—আমারেই যে
খুঁজ্‌তেছিলো ঐ আঁখি—
তারে আবার মোর আঁখিতে
দেখ্‌তে কভু পাবো নাকি ?

আর্তনাদ

সতা সত্য বলো, প্রভু,
আর কত ক্লেশ বাকী,
গতজীবনের বিষম শাপ
কভু হবে শেষ নাকি ?

সত্য করে বলো, প্রভু,
কতো আর বাকী রাত,
এই বিরহীর প্রেম-গগনে
কভু কি হবে না প্রাত ??

আর কোনো দিন

যেতে দাও, বন্ধু, আজি—
দেখা যদি হয় আবার,
শুনায়ে দেবো বেদন-গীতি
হৃদয়-মন করি উজাড় ।

সেই সে দিনে তোমায় আমি
ঐ গীতি-ও শুনায়ে দেবো
যার কাঁদনের করুণ সুরে
নিখিল-হৃদয় দুলায়ে দেবো

পরিশিষ্ট

(মূল হিন্দী কাব্যের জন্য লিখিত ভূমিকা)

জনাব মাহমূদ বিরচিত 'কুটজ' মোট চব্বিশটি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলো যেন এক একটা হোমিওপ্যাথিক ডোজ, চার লাইন থেকে ২৪ লাইন পর্যন্ত লম্বা। তবু এদের প্রভাব হৃদয়বৃত্তিকে রীতিমত আলোড়িত করে তোলে: লেখকের হৃদ-স্পন্দনের আভাস পেয়ে পাঠকের হৃদয়-বীণায় জেগে ওঠে সহস্পন্দন। কবিতাগুলো গীতিধর্মী—এদের জন্ম প্রেমে, প্রকাশ সঙ্গীতে, আর পরিণতি বিরহের অলক্ষ্য ফল্গু ধারায়।

আলোচ্য গীতি-কবিতার বাণী হিন্দী হ'লেও তা পূর্ব পাকি-স্তানীদের কাছে সহজ-বোধ্য। প্রেমের ভাষা সার্ব-জনীন, তাই বুঝি এত সহজ আর ইঙ্গিতপূর্ণ। কবি তাঁর প্রাথমিক বক্তৃতায় বলেছেন,—

> "বন্ধু, ন পূছো মুঝ্‌সে মেরে
> ইন্‌ গীতোঁ কা জনম-বিকাশ,
> কিসী দিবস আ লিখ্‌ যাওয়েগা
> স্বয়ং প্রেম ইনকা ইতিহাস।"

তবু, কবি-বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায়, কবিতা-গুলো সাজাবার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে; অর্থাৎ প্রেমের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই গীতগুলোরও জন্ম-বিকাশ ঘটেছে।

কোনও এক কবিতা-রাণীকে অবলম্বন করেই প্রথম গীত উদ্‌গত হ'য়েছে; প্রেমের গীত হ'লেও যেন বলি বলি করেও সে প্রেম ব্যক্ত হয় নি। তবু কবির আশা এই যে অন্তর্যামী প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে প্রিয়তমার হৃদয়ে গড়ে উঠবে কবির জন্য একটি ক্ষুদ্র নিকেতন; আর সেইটেই হবে রাজভবনের চেয়ে বা মণিমাণিক্য ও শান-শওকতের চেয়ে অধিক মূল্যবান। কবির মনে এক সময় জিজ্ঞাসা উঠলো,—'প্রেমের কীমৎ কত?' প্রেম কানে কানে বললো,—'সর্বস্বসমর্পণ'। অমনি কবির মনে হ'ল 'বাঃ বেশ সহজ তো?' এই চিন্তা করবামাত্র বাণী এলো,— "সহজ নয়। বড় কঠিন পরকে আপন করা, বড় কঠিন প্রেমরত্ন লাভ কর', বড় কঠিন অবিচল প্রেম রক্ষা করা, বড় কঠিন প্রেমিক হওয়া।"

কবির প্রেম-স্বরূপা বাহু-বন্ধনে ধরা দেবার পাত্রী নয়, কিন্তু প্রেম-বন্ধনে অনায়াসেই ধরা দিল। কিন্তু হায়, কবি কি তখন বুঝেছিলেন প্রেম কত বিষ-জ্বালায় ভরা!

এরপর এলো বিচ্ছেদ। বিদায়ক্ষণে কবির 'মধুরা' জিজ্ঞাসা করলো, 'আবার কবে আসবে প্রিয়তম?' আকুল কণ্ঠের এই সকরুণ ধ্বনিতে কবির সারা অন্তর ভরে উঠলো, কিন্তু মুখে বাণী ফুটল না, জিজ্ঞাসার জওয়াব দেওয়া হ'ল না। এর কয়েক বছর পরে কবি আবার ফিরে আসলেন রামটেক শৈলশিখরে, যেখানে 'মধুরাণী'র সঙ্গে প্রথম প্রেম-মিলন হয়। কিন্তু—'কোথায় মধু-

রাণী ?' কবির অশ্রুজলে ভরা প্রশ্নের উগ্রমৌন জওয়াব আসে- 'সে তো চলে গেছে রাজস্থানের পিলানীতে।'

এখন কবির মনে পড়ে স্মৃতিভাণ্ডারের যত পুরাণো কাহিনী। হায়, কে জান্‌তো তাকে এই ভাবে একা একাই জগতের সঙ্কট-সঙ্কুল কণ্টকপথে দুঃখের ঘন-ঘোর বাদল দিনে প্রিয়ার উদ্দেশে অবিরাম পথ চলতে হবে, আর বয়ে বেড়াতে হ'বে তার শ্রমক্লান্ত অবসন্ন তনু। কবি ভাবেন, হায় নিঠুরা প্রিয়া, যদি একবার মাত্র তোমাকে আমার বেদন-গীতি শুনাতে পারতাম তা'হলে তোমার চোখেও বর্ষণ নাম্‌তো। তা' যখন হবার নয়, তখন আমাকে বধ ক'রে ফেল, আমার ক্লেশের অবসান হোক। হায় বিধি! তুমি কেন এমন নিদয়-নিঠুর হৃদয় সৃষ্টি করেছে, যে পরের দুঃখ বোঝেনা, পরের প্রতি যার কণা-মাত্র কৃপা নাই ?

এরপর কবির হঠাৎ মনে পড়ে—'হায়, আমি এ কি করছি ? কেবল নিজের কথাই যে ভাবছি। প্রেমদেব ত বলেছিলেন, আমার প্রেম-সাধ তখনই পূর্ণ হবে যখন আমি করতে পারব আমার সর্বস্ব সমর্পণ! সত্যিই ত, প্রেম অত সহজ নয়। তখন কবি নিজের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর প্রিয়ার দিক থেকে ব্যাপারটা ভাবতে শুরু করেন। তখন কবির মন গেয়ে উঠলো,

"সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই,
তুমি হও সব সুখের ভাগী।"

কবি কখনও প্রার্থনা করেন, "প্রভুবর আমার প্রিয়ার পথের

সব কাঁটাকে আমার প্রণয়-মন্ত্রের উপরোধে ফুল ক'রে দাও।" কখনও প্রার্থনা করেন, "আমি মরে যাই তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার কবরের সিথানে একটি ফলকে লিখে রেখো 'প্রেম অমর'।" আবার কখনও অনুযোগ করেন, "হে প্রভু, দেখতো আমাকে কি বিভ্রাটে ফেলেছ : যদি আমার সুভদ্রাকে না পেলাম, তবে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি ? আবার, সুভদ্রাকে না দেখেই বা এ জগত থেকে বিদায় নিই কেমন করে ?"

কবির মন এখন সুভদ্রার ধ্যানে ভরপুর,—জগৎ সুভদ্রাময়। তাকে পাবার আশায় বা না-পাবার আশঙ্কায় কবি-হৃদয় আন্দোলিত। কখনও মনে হয়, আজকের ডাকে বুঝি প্রিয়তমার চিঠি আসবে। আবার মনে হয়, যে-আঁখির কৃপা-দৃষ্টি লাভের জন্য জগৎশুদ্ধ সকলেই উদ্‌গ্রীব, সেদিন প্লাটফর্মে তো সেই যুগল আঁখি কেবল আমাকেই খুঁজে ফিরেছিল। আবার কবে আমি এই চর্ম-চক্ষে সেই প্রিয় আঁখিদুটি দেখে জীবন সার্থক করতে পাব ?

কবির অন্তর কেঁদে ওঠে প্রিয়া-বিরহে। কবে পূর্ব-জন্মের শাপমোচন হবে ? পুনর্জন্মের মিলন প্রভাতের আর কত দেরী ? তারপর, কবি যেন পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়ের দিন প্রিয়তমার উদ্দেশে বলছেন 'হে বন্ধু, এ জীবনে ত আমার হৃদয়-ব্যথা তোমাকে কিছুই জানিয়ে যেতে পারলাম না। কিন্তু আর একদিন আমি নিশ্চয়ই ফিরে আসব। সেদিন আমার নিজের সমুদয়

ব্যথা-বেদনার কাহিনী ত শুনাবই,—সেই সঙ্গে আরো শুনাব নিখিল-বেদনার এমন একটি উতরোল গীতি যার আকুল ক্রন্দন-ধ্বনিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের হৃদয় কেঁপে উঠবে।

প্রেমের এই চিরন্তন ইতিহাস কবি গেঁথেছেন কয়েকটি কবিতার মালায়। বিরহী যক্ষ যেমন মেঘ-দূতের হাত দিয়ে এক আঁজলা কুটজফুল বা গিরিমল্লিকা পাঠিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশে, কবিও তেমনি রামগিরি পর্বতের তটবর্তী রামটেকের মনোরম কুঞ্জভবন থেকে হৃদয়-কুসুম চয়ন ক'রে পাঠাচ্ছেন রাজ-স্থানের পিলানী গ্রামে—যেখানে তাঁর 'কানী' নাম্নী কবিতা-রাণী, প্রিয়বালা, সুভদ্রা, রাণী, সুকুমারী, মধুবালা, মধুরা, মধু-রাণী বা বঁধুয়া অবস্থান করছেন। এগুলো পালাগানের মত করে একের পর একটি গাওয়া যেতে পারে। তা'তে এক চমৎকার দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি হবে,—যেমন রেখে গেছেন আমাদের পল্লীর আদিম স্বভাব-কবিরা মন-কুসুমের বনমাল্য বিনসূতের নিবিড় বন্ধনে!

কবির মর্মজাত এই কুটজগুচ্ছ অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানের মর্মজ্ঞ কাব্য-রসিকদের মর্ম স্পর্শ করবে। এজন্য হাজার শুকরিয়া।

—কাজী মোতাহার হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা